দার্শনিক প্রশ্নে
আল কুরআন

আমিন আহসান ইসলাহী

কাজী একরাম
অনূদিত

ঐতিহ্য

বই প্রসঙ্গে কিছু কথা

কুরআন ও দর্শনের মুখোমুখি অধ্যয়ন

না কাব্য, না গদ্য, না কোনো শাস্ত্র। আল কুরআন নিছকই আল কুরআন। ধর্মতাত্ত্বিকদের জন্য ধর্মীয় বিধান, প্রজ্ঞা, নির্দেশনা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার এক পৃথিবী, বিজ্ঞানীদের জন্য বিজ্ঞানের এক বিদ্যায়তন, শব্দ ব্যুৎপত্তিতে দক্ষ পণ্ডিতদের জন্য এক অভিধান, ব্যাকরণবিদদের জন্য ব্যাকরণের এক বুনিয়াদ, কবিদের জন্য শব্দ ও অর্থালঙ্কারের বর্ণিল আকাশ, নীতিশাস্ত্রবিদদের জন্য নীতিবিদ্যার আকর-উৎস, ঐতিহাসিক, শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর গুরুত্ব এনসাইক্লোপেডিয়ার চেয়েও লক্ষগুণ বেশি, আইন প্রণেতাদের নিকট আইন প্রণয়নের বিশাল বিধিমালার তথ্যকোষ, দার্শনিকদের জন্য দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির বিপুল ভান্ডার। কিন্তু কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বিষয়েরই একক গ্রন্থ নয়। কুরআন এক সময় মানুষকে বিস্মিত করে, এরপর সম্মোহিত করে এবং সবশেষে অদ্ভুত এক মনোতরঙ্গে তাকে সন্তরণ করায়। মৃন্ময় ও সাধারণ সৌন্দর্যতাত্ত্বিক আদর্শের বিচারে এ গ্রন্থের সাহিত্যিক ও দার্শনিক উৎকর্ষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর হেদায়েত।

হেদায়েতের এই মহাগ্রন্থ মানবজীবনকে সকল পথে, সকল উপায়ে, সকল মাত্রায় আলিঙ্গন করে, নিকষিত, বিকশিত ও বিভূষিত করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবজাতির সকল কর্মকাণ্ডের জন্য সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এর বাণীসমূহ যে কোনো দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞানের চেয়ে অধিক আবেদন ও অর্থময়, অধিক মহিমামণ্ডিত। এর প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার প্রকাশক। ফলে তাকে দার্শনিক বিষয়াবলির বিন্যস্ত অবয়বে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা যেমন যথার্থ নয়, তেমনি তার অন্তর্দৃষ্টিসমূহ বাদ দিয়ে দার্শনিক জিজ্ঞাসাসমূহের মীমাংসা করাও হবে আত্মঘাত। ফলে আমাদের দেখতে হবে আল কুরআনে জীবনের দার্শনিক প্রশ্ন ও প্রসঙ্গসমূহ

কীভাবে বিবৃত ও প্রতিফলিত হয়েছে। আর জীবনের কাছে তার বার্তা কী, আবেদন কী!

আল কুরআনে দার্শনিক মুখ্য ও অবধারিত প্রশ্নসমূহের সুরাহা বাঙ্ময়, তার মধ্যে রয়েছে চারটি কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। সেগুলো হচ্ছে : (১) মানুষ কী ও কেন, এই প্রশ্নের জবাব। তার পরিচয় ও সংজ্ঞা এবং বিশ্বব্যবস্থায় তার অবস্থান ও ভূমিকা কী, সেটা স্পষ্টকরণ। এখানে তার পদমর্যাদা ও দায়িত্বের প্রশ্নের কুরআনী সুরাহা। (২) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, পরিবার ও সমাজে মানুষের ভূমিকা ও এর ভিত্তি। সম্মিলিত জীবনে মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিমানুষের করণীয়। (৩) অপরাপর প্রাণ ও প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টিজগতে তার ভূমিকার ভিত্তি এবং বস্তুজগৎ ব্যবহারে তার অধিকার, দায় ও দায়িত্ব। (৪) মানুষ ও স্রষ্টার সম্পর্কসূত্র। এখানে মানুষের পরিচিতি ও ভূমিকা এবং স্রষ্টার আনুগত্যের দায় ও দায়িত্ব এবং (৫) রুহের স্বরূপ, ভূমিকা ও হাকিকত, যা খোদাতত্ত্ব এবং জীবনের মূল্য ও পরকালীন অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত।

কুরআনের আলোচনায় এসেছে জীবন, জগৎ, জ্ঞান, মূল্যতত্ত্ব, যৌক্তিকতা, মূল্যবোধ, জড়, প্রাণ, মন, স্রষ্টার একত্ব ও নিখিলে তার কর্ম ও এর প্রকাশ। মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিকের প্রতি আপন আদলে মনোযোগ দিয়েছে আল কুরআন। দর্শনও মানব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। দার্শনিক মনোযোগ ও আলোচনাসীমায় বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক ও অবধারিত। এসব বিষয়কে সাধারণত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যেমন : ১. বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) ২. তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) ৩. মনোদর্শন (Philosophy of mind) ৪. জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) ৫. মূল্যবিদ্যা বা মূল্যসম্পর্কীয় দর্শন (Axiology)।

আল কুরআনে আমরা দেখি, এসব আলোচ্যবিষয় নানাভাবে হাজির হয়েছে। এই হাজিরি ঘটেছে কুরআনের ইজাজ বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসহকারে, একেবারে নিজের মতো করে, দার্শনিকদের মতো করে নয়।

কুরআন সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করে এক কেন্দ্রীয় সত্যের আওতায়। ফলে তাতে হাজির হওয়া বিষয়ের একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না, দূরবর্তী হয় না। সব বিভিন্নতা এখানে পরস্পরলগ্ন। আল্লাহর পরিচয় ও তার সাথে সম্পর্ক এখানে এমন এক কেন্দ্রীয় বন্ধনসূত্র, যা সমস্ত কিছুকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে, লগ্ন করে এবং চরিত্রদান করে। জীব, জড়, চিন্তা, কর্ম, যুক্তি, ভাব, ব্যক্তির আত্ম-পর, আত্ম-চেতনা, সমাজ-চেতনা, বিশ্বলোক-

ভাবনা ইত্যাদিকে আল কুরআন একটি যৌথ শৃঙ্খলায় প্রতিস্থাপন করে, যার চরিত্র ঠিক করে দেয় ফিতরাত বা স্বভাবগত স্বাভাবিকতা। কুরআনের ভাষায় এই জীবনপন্থা সমস্ত স্বাভাবিকতাকে ধারণ করে সরল, সহজ, যথাযথ ও যথোচিত ভাবাদর্শ ও কর্মপন্থা হাজির করে, যার নাম সিরাতুল মুস্তাকিম– সহজ-সরল পথ। যা মানুষকে প্রকৃত কল্যাণ, মহাসত্য ও পরম সৌভাগ্য লাভ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

সিরাতে মুস্তাকিমের তত্ত্বীয় বয়ান ভালো-মন্দের মানদণ্ড, মানবচেতনার বিকাশ ও প্রশিক্ষণের পথনির্দেশ করেই অগ্রসর হয়। তা মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে, জগতের নশ্বরতা-অনশ্বরতার মীমাংসা করে, মানুষের অস্তিত্ব ও বিশ্বজগতের স্বরূপ নিয়ে সুনিশ্চিত বক্তব্য উপস্থাপন করে। এসব বিষয়ে আলাপ করেন দার্শনিকগণও। প্রাচীন মিশরীয় দর্শন, ভারতীয় দর্শন, চীনা দর্শন, গ্রিক দর্শন যেমন এমন বিষয়ে মনোযোগী, তেমনি দর্শনের আধুনিক ও উত্তরাধুনিক পরিক্রমাও এই প্রসঙ্গকে এড়িয়ে পথ চলতে পারেনি, পারবে না। দার্শনিক আলাপ ও অন্তর্দৃষ্টিসমূহ মানুষের চিন্তা ও মনের বিকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাবে দর্শনশাস্ত্র বহু মতামতের রণাঙ্গণ হয়ে উঠেছে। কোনো ঐকমত্যের সত্যকে আলিঙ্গন করতে পারেনি। এটা এ জন্যই যে, প্রত্যেক দার্শনিকই নিজস্ব দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণের সন্তান। কিন্তু প্রত্যেকের দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ আলাদা হয়, কোনো দৃষ্টিই সব কিছু একসাথে দেখে না। ফলে কোনো দৃষ্টিকোণেই সকল সত্য ও সকল বাস্তবতা হাজির থাকে না। এই গরহাজিরির নজির দেখা যাবে দর্শনের পথচলার প্রতিটি ধাপে। প্রত্যেক দার্শনিকের রচনা পরস্পরের সাথে যে বিরোধিতা করে, এই বিরোধিতার ভেতর থেকে যে প্রস্তাবনা বেরিয়ে আসে, তার কোনটা সত্য? কোনো প্রস্তাবনাই সুনিশ্চিত সত্যকে ধরতে পারছে না এবং পরবর্তী দার্শনিক প্রস্তাবনার সামনে প্রত্যাখ্যাত কিংবা নিন্দিত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে। একটি দার্শনিক ভাবধারাকে সমর্থনকারীদের একটি সম্প্রদায় তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে দাঁড়াচ্ছে আরেক সম্প্রদায়। প্রত্যেকের উচ্চারণে সত্যের ছিটেফোঁটা থাকছে। কেউই পুরোপুরি সত্য বঞ্চিত নন, কেউই সত্যকে আলিঙ্গন করছেন না সামগ্রিক অর্থে। এমনকি সেই দাবিও করতে পারছেন না। এটাই স্বাভাবিক। মানবীয় ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞা মানুষকে সত্যের সবটুকু দিতে পারে না। যা দেয়, তার মধ্যে থেকে যায় দ্বিধা, সংশয়, অসম্পূর্ণতা। কিন্তু দর্শনের কাজই হলো সত্যকে তালাশ ও অবলম্বন। দ্বিধা, সংশয়, অসম্পূর্ণতা নিয়ে সত্যকে সুনিশ্চিত করতে দার্শনিকরা কতদূর এগুলেন?

সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকদের আমরা জানি, জানি সক্রেটিস ও তার সমকালীন দার্শনিকদেরও। জীবন ও জগৎ নিয়ে তাদের বিতর্কগুলো আমরা দেখি। তারা কি স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রশান্তিতে প্রবুদ্ধ করতে পেরেছেন? তাদের কাছে স্রষ্টার স্বরূপ কি চরম বিতর্ক-জর্জরিত, অসম্পূর্ণ ও অস্বচ্ছ কিছু আইডিয়া নয়, যা প্রতীতিতে পরিণত হতে পারছে না? তাদের কেউ কেউ স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছেন। সেই অস্বীকৃতিও সমকালীন ধর্মের সাথে দ্বন্দ্বের ফসল এবং সেখানেও পাওয়া যাবে স্রষ্টার প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি। আবার যে সক্রেটিস স্রষ্টাকে নিখিলের আদিকারণ বলছেন, তিনিই আবার বিশ্বপরিচালনায় তাকে নিষ্ক্রিয় বলে ভাবছেন। শুধু প্রথম কারণই তিনি। এরপরে তার আর কোনো ভূমিকা নেই। গ্রিক দর্শন স্রষ্টাকে স্বীকার করে আবার করে না। স্বীকৃতিবাদী দর্শন তাকে স্রষ্টা মানে আবার মানে না। যারা স্রষ্টা মানছেন, তারা তাকে জগৎ ও জীবনের পরিচালক বলে মানেন আবার মানেন না। যারা পরিচালক বলে মানেন, তাদের কাছে তিনি নানা রকম। তার সামগ্রিক পরিচয় ও গুণাবলি অস্পষ্ট, অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেখানে একজীবন বিচরণ করা যায়, কিন্তু কোনো স্থির বিশ্বাসের নাগাল মিলে না। মানুষ ও মানুষের পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক কী, সেটাও অস্পষ্ট, অন্ধকার। মানুষের লক্ষ্য কী, কল্যাণ কোথায়, সুখ ও সাফল্যের স্বরূপ কী, সেটাও কুহেলিকাময় একটি কথামালার দুনিয়া হয়ে রইল।

প্লেটো-অ্যারিস্টটলের দর্শনের উদর থেকে বেরিয়ে এলো এপিকিউরিয়ান মতবাদ। এর প্রবক্তা এপিকিউরিয়ানের জন্ম হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১ অব্দে, গ্রিসে। এপিকিউরিয়ান মতবাদ তালাশ করল মানবজীবনের লক্ষ্য ও সাফল্য। সে প্রস্তাব করল জীবনের উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক আনন্দ বা সুখ অর্জন করা। এটাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু ব্যক্তির সুখ কোথায়? লুঠেরার সুখ নিশ্চিত করতে চাইলে লুণ্ঠিতের কী উপায়? জালেমের সুখ নিশ্চিত করলে মজলুমের কী হবে? সর্বোচ্চ সুখের মাত্রাটা কী, পরিধি কেমন? আর সর্বোচ্চ সুখই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে আরেকজনের সুখ না কেড়ে তা কীভাবে নিশ্চিত হবে, এর কোনো উচিত ফর্মুলা এপিকিউরীয় দর্শনের ভাড়ারে নেই। এপিকিউরীয়দের আত্মকেন্দ্রিকতার দর্শনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল স্টোয়িক দর্শনে। গ্রিক দার্শনিক জেনোকে স্টোয়িক দর্শনের প্রবর্তক মনে করা হয়। গ্রিসের সিটিয়ামে স্টোয়া পয়কিলে নামক একটি আর্ট গ্যালারিতে এই দর্শনের মূল তত্ত্বটিকে প্রথম তুলে ধরেন জেনো। 'স্টোয়া' কথাটি থেকেই এই দর্শনের নাম হয় স্টোয়িসিজম। ক্লেথিস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪-২৩২), টরপাসের ক্রিসিপাস (খ্রি. পূ. ২৮০-২১০)-এর হাতে মতবাদটির প্রথম পর্ব গ্রিসে অতিবাহিত হয়।

দ্বিতীয় পর্ব প্রসারিত হয় রোমে, ১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে এই পর্ব। সেনেকা (৩ খ্রি.পূ.-৬৫ খ্রি.), এপিক্টেটাস (৫০-১৩০ খ্রি.), মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রি.) প্রমুখ দার্শনিক স্টোয়িক মতবাদের শেষ পর্বের ভাষ্যকার। স্টোয়িকদের মতে সুখ নয়, পুণ্য, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বশীলতাই হলো মানবজীবনের আদর্শ। আত্মসংরক্ষণ মানুষের আসল প্রয়োজন। নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে। বিশ্বজনীন আদর্শের কাছে নিজের সুখ ও আনন্দকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু এই মতবাদের আবেদন বৈরাগ্যবাদে পরিণত হলো। স্টোয়িকরা ঘোষণা করেছিলেন– স্বাস্থ্য, সম্মান, সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি বাহ্য সম্পদের কোনো স্বকীয় মূল্য নেই। ধর্মকে তারা কামনা করতেন জীবনে। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবাস্তব। তাদের মতে, ব্যক্তিমাত্রই হয় সব বিষয়ে সৎ, না হয় সব বিষয়েই অসৎ। যিনি দোষমুক্ত এবং সম্পূর্ণ সৎ, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। কেউ আংশিকভাবে রিপুর অনুসরণ করলে তিনি আর ভালো মানুষ নন। যার মধ্যে প্রজ্ঞার সামান্যতম অভাব রয়েছে, তিনিও অধার্মিক। ধর্মকে হয় সামগ্রিকভাবে পেতে হবে, আর না হয় একেবারেই নয়। সামগ্রিকভাবে ধর্মকে পাবার জন্য মানুষ নিজের প্রকৃতি থেকে পলায়ন করেছে। ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে ঘটেছে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ধর্ম চলে গেছে প্রান্তিকতার শেষ সীমায়, মানব প্রকৃতির দাবিও হাত মিলিয়েছে শেষ অবধি প্রবৃত্তির সাথে। কারণ ধর্ম তাকে লাঞ্ছিত করেছে প্রতিনিয়ত। খ্রিষ্টধর্মের হাতে এ দর্শনের পরাজয় ঘটলেও শিকারি শেষ অবধি শিকারে পরিণত হয়। নব্য প্লেটোবাদ ও স্টোয়িক বৈরাগ্যবাদ খ্রিষ্টধর্মের সীমানার ওপর প্রতিকারহীন মেঘের মতো ছেয়ে যায়। এরপর পশ্চিমা দর্শনকে শাসন করেছে খ্রিষ্টবাদ। দীর্ঘ অন্ধকার ও বর্বরতার গহ্বর থেকে মাথা তুলে যখন স্কলাস্টিক দর্শনের যুগ আসল, তখনো স্টোয়িক প্রভাব খ্রিষ্টীয় দর্শনের এক তীব্র বাস্তবতা। জ্ঞানে অনগ্রসরতা, অবরোহমূলক সীমাবদ্ধতা, অন্ধবিশ্বাসে একরৈখিকতা, গির্জার অপ্রতিহত প্রভাব, সংশয়পীড়িত কূটাভাষ, প্রান্তিক মরমিতা স্কলাস্টিক দর্শনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হলেও তাতে মুসলিম দর্শনের প্রচণ্ড প্রভাব তৈরি হয়েছিল। মধ্যযুগের পশ্চিমা দর্শন বরাবরই অদৃষ্টবাদের সেবা করেছে। জীবনে তিক্তময় ও বেদনাদায়ক অনুভূতি ছিল সে অদৃষ্টবাদের ভিত্তি। গির্জার বিচার নির্বিচারে মেনে নেওয়াটাই ছিল তার বিচার। ফলে খ্রিষ্টধর্মের সমসাময়িক ইতিহাসই মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দর্শনের ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রি.) ও অন্যান্য যাজক এর অনুশীলন করেছেন। নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত

পাদরি ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে এর নতুন মাত্রা আসে। সেন্ট আনসেলম (১০৩৩-১১০৯ খ্রি.), পিটার অ্যাবেলার্ড (১০৭৯-১১৪২ খ্রি.), সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রি.) এই ধারার প্রধান পুরুষ। এই পর্বের চিন্তকরা আরব দর্শনের প্রভাবকে অধিগ্রহণ করেন। ফলে যুক্তির ভিত্তিতে ধর্মকে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা ছিল তাদের মধ্যে। তাদের বিচার-বিশ্লেষণ কিছুটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার রূপ ধারণ করে। বিশেষত আল ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে তুফায়েল ও ইবনে রুশদের আবেদন তার মধ্যে প্রকৃতিসন্ধানী ও অভিজ্ঞতাবাদী অবগাহনে বাস্তবতার যৌক্তিক পরিসর তৈরি করে। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.), রবার্ট গ্রসেটেস্ট (১২৩৫-১২৫৩ খ্রি.) প্রমুখের হাত ধরে এই প্রভাব রেনেসাঁর যুগে প্রবেশ করে। সামনে আসেন টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রি.), ডেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.), স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রি.), জন লক (১৬৩২-১৭০৪), লিবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রি.) প্রমুখ। কিন্তু পশ্চিমা দর্শন খোদাতত্ত্বে, অধিবিদ্যায়, জ্ঞানতত্ত্বে, মূল্যতত্ত্বে সংশয়, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ববিক্ষত চরিত্রকেই বহাল রাখল। অস্থিরতাই তার চরিত্রের প্রধান প্রবণতা হয়ে রইল। যা নতুন শিরোনাম, নতুন চিন্তাপ্রক্রিয়া, নতুন আলোচনাধারা এবং নতুন তত্ত্বের জোয়ারের মধ্যেও মৌলিক স্বভাব বদলাতে পারল না।

অষ্টাদশ শতকের জর্জ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩ খ্রি.), ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রি.), এডমান্ড বার্ক (১৭২৯ -১৭৯৭ খ্রি.), অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রি.), ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.), জঁ-জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রি.), গেয়র্গ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রি.)। উনিশ শতকের সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫ খ্রি.), শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০ খ্রি.), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রিডরিখ নিটশে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রি.), হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩ খ্রি.), এমিল মাক্স ভেবার (১৮৬৪-১৯২০ খ্রি.)। বিশ শতকের দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১ খ্রি.), বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯ -১৯৭৬ খ্রি.), জঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০ খ্রি.), জন বোর্ডলি রলস (১৯২১-২০০২ খ্রি.), ফ্রেডরিখ অগাস্ট ভন হায়েক (১৮৯৯-১৯৯২ খ্রি.), থমাস স্যামুয়েল কুন (১৯২২-১৯৯৬ খ্রি.), কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪ খ্রি.), জাক মারি এমিল লাকঁ (১৯০১-১৯৮১ খ্রি.), মার্শাল ম্যাকলুহান (১৯১১-১৯৮০ খ্রি.), কিংবা জ্যাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪ খ্রি.), নোয়াম চমস্কি (১৯২৮-) আমাদের জন্য গ্রিক ও রোমানদের ভাববাদ-বস্তুবাদ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, খ্রিষ্টীয় উত্তরাধিকার এবং ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি থেকে ভিন্ন কোনো আলোকের

উদয় ঘটান না। এইসব দার্শনিক মহান চিন্তা ও অনুভবের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন। তাদের চিন্তা ও ভাবধারায় পৃথিবীতে এসেছে বহু পরিবর্তন, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব। মানুষের দৃষ্টি ও সৃষ্টি হয়েছে অধিকতর প্রসারিত, বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম। চিন্তাসম্পদে জগতের জ্ঞানভান্ডার হয়েছে নানাভাবে ঋদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত যে সত্য, সেই সত্যের নাগাল তারা পাবেন কোথা থেকে? কিন্তু সেই সত্যের দিশা ছাড়া আমরা আমাদের জীবনের উৎস ও পরিণতিকে ব্যাখ্যা করতে পারি না, ফলে কর্তব্য ও উদ্দেশ্যকেও যথার্থতায় অবলোকন করতে পারি না। সঠিক পথ যদি না থাকে, গন্তব্য অধরা থাকবেই। দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা যদি না থাকে, সাফল্য ও বিজয় নিশ্চিত হবে না।

ইসলাম তাই সকল কালের সকল পয়গম্বরদের শিক্ষা ও পয়গামকে আমাদের সামনে হাজির করেছে। যার সারবস্তু ও চূড়ান্ত উপসংহার হচ্ছে আল কুরআন। সেখানে মানুষের জ্ঞানলাভের সহজাত উপায়ের স্বীকৃতি রয়েছে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বাস্তব যাচাই-বিশ্লেষণ, জ্ঞানীয় প্রথা, প্রজ্ঞা ইত্যাদিকে অব্যাহতভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করেছে। যা মূলত দার্শনিকদের বিচরণের দুনিয়া। কিন্তু সেই দুনিয়ার ওপরে মোকাশাফা বা অন্তর্চক্ষু উন্মোচন, ইলহাম বা অন্তরে অবতরণকৃত অভিজ্ঞান, মুশাহাদা বা আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণের মতো স্তরও নির্দেশ করেছে। এর মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জিত হয়। কিন্তু এগুলোও সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। সংশয়ের ঊর্ধ্বে যে সুনিশ্চিত সত্য, সে হচ্ছে ওহি। আল কুরআন সেই ওহির অবিকৃত ও সর্বশেষ, চূড়ান্ত হেদায়েত। যা জীবন ও জগৎকে বিচারের এমন পথনির্দেশ করে, যা জগৎসৃষ্টি ও এর পরিচালনাকে উদ্দেশ্যমূলক শৃঙ্খলা হিসেবে উপস্থাপন করে। এর সকল উপাদান এবং বস্তু-অবস্তুকে বিচারের সমস্ত মাত্রাকে স্বীকার করেও একটি বিশ্বাসজাত ও উদ্দেশ্যমুখী অন্তর্দৃষ্টি উপস্থাপন করে। মানুষের জন্ম, বেড়ে ওঠা, জীবনপরিক্রমা ইত্যাদিকে সেই সমন্বিত লক্ষ্যের চালকে পরিণত করে। এর মধ্য দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট, অসংশয় দৃষ্টিভঙ্গি হাজির হয়; যা প্রাকৃতিক সহজতা ও স্বাভাবিকতার মতোই অমোঘ, সরল ও অবধারিত।

দার্শনিকদের জীবনভাবনা, জীবনবিচার ও জীবন-অধ্যয়নকে ওহিভিত্তিক সেই জীবনবাদের মুখোমুখি করা এমন এক কাজ, যা বিশ্বাসী ও চিন্তাশীল মানুষের জন্য যেমন জরুরি, তেমনি অবিশ্বাসীদের জন্যও এই প্রজ্ঞার প্রয়োজন রয়েছে। বিদগ্ধ চিন্তক ও তাফসিরবিদ আমিন আহসান ইসলাহী (১৯০৪-১৯৯৭ খ্রি.) এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক ছয়টি লেকচারের সম্পাদিত সংকলন এই গ্রন্থ। এতে তিনি আল্লাহর সত্তা ও

গুণাবলি, বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান, ভালো ও মন্দের স্বরূপ, অদৃষ্টের বাধ্যতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা, পরকালীন জীবন এবং শাস্তি ও পুরস্কার এবং নবুয়ত-ব্যবস্থার স্বরূপ ও তাৎপর্যকে চিত্রিত করেছেন আপন প্রজ্ঞাপ্রসূত ভাষ্যে। আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা ও আপত্তির বিচিত্র অন্ধকার এলাকায় করেছেন আলোকপাত; যা সম্পন্ন করা ইলমে কালামের দাবি, দ্বীনি কর্তব্য। খুশির কথা, গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থের তর্জমা করেছে প্রীতিভাজন মাওলানা কাজী একরাম। মা'হাদের গবেষণা বিভাগে তার অধ্যয়নকালে যে কাজগুলো হাতে নেওয়া হয়, এর একটি হলো এই গ্রন্থের অনুবাদ। তার অনুবাদের মেজাজ গতিশীল ও সুখদ। পাঠকের জন্য তা ভারী কিংবা আজনবি মনে হয় না। মনে হয় সুগম বয়ান, সাবলীল রচনা।

বইটির গুরুত্ব স্বয়ংপ্রকাশ। এর বহুল পঠন প্রত্যাশিত।

মুসা আল হাফিজ
২৯ আগস্ট ২০২৩

প্রাক-কথন

সত্যের সন্ধান করা এবং সত্যের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা মানুষের চিরায়ত অভ্যাস। মানুষের সামনে কিছু জিজ্ঞাসা এমন থেকেছে যার সমাধানে সে সর্বদা সংগ্রাম করে চলেছে। যেমন, তার নিজের অস্তিত্ব, বিশ্বজগতের বাস্তবতা এবং তার স্রষ্টা তার সামনে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো সতত বিরাজমান। মানুষ কোথা থেকে এসেছে? কেন তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে? এতে তার অবস্থান কী? কেন মানুষের মধ্যে ভালো এবং মন্দ মানুষ পাওয়া যায়? ভালো-মন্দের কোনো মানদণ্ড আছে কি? মানুষ কাজ করতে স্বাধীন না বাধ্যগত? তার জন্য কোনো পথনির্দেশের উৎস আছে কি? এই জগৎ কি চিরন্তন, না এর শেষ হওয়া অবধারিত? অনুরূপ অনেক প্রশ্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষের সম্মুখে হাজির থেকেছে, যাদেরকে দুনিয়া দার্শনিক এবং হাকিম বলে জানে। মানুষের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও প্রশিক্ষণে এই মানুষগুলো বিরাট ভূমিকা রেখেছেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধি-শক্তির উপর নির্ভরশীল, তাই মানুষের সম্মুখীন এসব মৌলিক সমস্যার উত্তরে তাঁরা একমত হতে পারেননি। ফলত, দর্শনশাস্ত্রে এসব প্রশ্নের উত্তরে কোনো ঐক্য ও সাযুজ্য নেই।

মানুষের সম্মুখীন এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব এখানে যে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এগুলোর উত্তরের উপর নির্ভর করে। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যেমন সঠিক পথ বেছে নেওয়া প্রয়োজন, তেমনি মানবজীবনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা সাফল্য ও বিজয়ের সঙ্গে জীবনের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন। এটা ধর্মের ক্ষেত্র, তাই ধর্মও দার্শনিকদের উপরোক্ত প্রশ্নগুলোতে অবতীর্ণ হয়েছে। এসবের উত্তর হয়েছে পয়গম্বরদের শিক্ষা এবং প্রেরিত কিতাবের বিষয়বস্তু। আল কুরআন হেদায়াত ও পথনির্দেশের সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। এতে যেখানে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে দর্শনের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কেও নির্দেশনা হাজির করা হয়েছে। কাজেই দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে আল কুরআনের ভিত্তিতে বিচার করা সময়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ জরুরত।

গ্রন্থকার আমিন আহসান ইসলাহী তাঁর সমগ্র জীবন কুরআনের উপর চিন্তা ও অভিনিবেশে বিনিয়োগ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত তাফসির 'তাদাব্বুরে কুরআন' আধুনিক ও প্রাচীন উভয় ধারার আলিম ও চিন্তকদের কাছ থেকে লাভ করেছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর। কুরআনের আলোকে দার্শনিকদের সম্মুখস্থ সমস্যাগুলো নিয়েও তিনি গভীর চিন্তানিয়োগ করেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর চিন্তার ফলাফল ও অনুসন্ধানগুলোকে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'এদারায়ে তাদাব্বুরে কুরআন ও হাদিস লাহোর'-এর আয়োজনে তিনি বেশ কিছু লেকচার দিয়েছিলেন, যাতে তিনি দার্শনিকদের মতামত তুলে ধরেন, সেগুলোর পর্যালোচনা করেন, দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেন এবং অবশেষে কুরআনের হিকমাহ ও প্রজ্ঞা ব্যাখ্যা করে তিনি দেখান কুরআন-প্রদত্ত সমাধান কতটা সুদৃঢ় ও পরিণত। দর্শনের মৌলিক বিষয় ও প্রশ্নাবলীর নির্ধারণ এবং দার্শনিকদের মতামত জানতে তিনি প্রধানত S. E. Frost এর THE BASIC TEACHINGS OF GREAT PHILOSOPHERS গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থটি ১৯৪২ সালে নিউ হোম লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত।

বর্তমান গ্রন্থটি সেসব লেকচারের সংকলন। স্বভাবতই বক্তৃতা এবং রচনার শৈলী সাধারণত আলাদা হয়। বক্তৃতায়, বক্তা তার শ্রোতাদের সাথে সংযোগ এবং তাদের চাহিদাকে বিবেচনায় রাখেন। জটিল বিষয়গুলো বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে একাধিক বার আলোচনায় হাজির হয়, তাই বক্তব্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। তদুপরি বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যের শৈলীগত সাদৃশ্য হওয়াও আবশ্যক নয়। এসব কারণে বক্তব্যকে আনুষ্ঠানিক রচনার রূপ দেওয়া খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। গ্রন্থটির বিন্যাস-কাঠামো এরূপ যে, আলোচ্য প্রতিটি বিষয়ে পূর্বোক্ত গ্রন্থ ছাড়াও, উইল ডুরান্টের THE STORY OF PHILOSOPHY থেকেও সহায়তা নেওয়া হয়েছে এবং দার্শনিকদের মতামতগুলোকে কিছুটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি খোলাসা পাঠক সম্মুখে হাজির হয়। বক্তৃতাগুলো সম্পাদনা ও সংযোজনের পর বর্তমান পাঠ্যরূপ লাভ করে। পাঠ্যটি মাওলানাকে দেখানো হলে তাঁর নির্দেশনার আলোকে আরও কিছু সংশোধন করা হয় এবং অতঃপর, গ্রন্থাকারে নিবেদন করা হয়।

ড. খালিদ মাসউদ
লাহোর
২৭ জুলাই ১৯৯১ খ্রি.

মুকাদ্দিমা

ধর্ম এবং দর্শন উভয়ই তাদের আসল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের পথনির্দেশের জন্য অস্তিত্বলাভ করেছে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তবে তা এই যে, দর্শন এই নির্দেশনার জন্য শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে ধর্ম বুদ্ধিকে কার্যকর করে, সেই সাথে মানুষকে ঐশী প্রত্যাদেশের আলোকে সমৃদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে মানুষ সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে, যা নিছক বুদ্ধির উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের কারণে, যারা ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তাদের পক্ষে বিষয়টি সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে যে তারা ধর্মের পাশাপাশি দর্শনের মৌলিক বিষয়াদি নিয়েও ভাববেন। এই সমান্তরাল অধ্যয়ন তাদেরকে উভয় বিষয়ের যুক্তি-পদ্ধতি বোঝার এবং ওজন করে দেখার সুযোগ করে দেবে, যদ্দরুন আশা করা যায় আল কুরআনের 'হিকমতে বালিগাহ' তথা চূড়ান্ত ও প্রত্যয়জনক প্রজ্ঞার তাৎপর্য ও মূল্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যা আল্লাহ চাহে তো তাদের ইমান ও বিশ্বাসবৃদ্ধির উৎস হবে।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রেওয়াজ পেয়ে গেছে যে, 'ধর্মের সাথে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম কেবল না বুঝে মেনে নেওয়ার ব্যাপার।' এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে, ধর্মের সাথে মানুষের সম্পর্ক এক নিদারুণ নিষ্প্রাণ সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়; যা না ইহকালে, না পরকালে কোনো কাজে আসে। এই ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির সংশোধনের প্রয়াসে আমি একদা কুরআন এবং দর্শনের মৌলিক সমস্যাবলির উপর কতিপয় লেকচার প্রদান করি, যা রেকর্ড করা হয়। এখন সকলের উপকারার্থে সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমাদের এক সতীর্থ এর ইংরেজি অনুবাদও করেছেন। সেটিও শীঘ্রই জনসমক্ষে আসবে, ইনশা আল্লাহ। আশা করি, ধর্ম ও দর্শনের এই তুলনামূলক অধ্যয়ন মানুষের জন্য চিন্তার নতুন পথ উন্মুক্ত করবে।

শুভেচ্ছান্তে
আমিন আহসান ইসলাহী
লাহোর, ২. ১৯৯০ খ্রি.

সূচিনির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণাবলি ২৩
দার্শনিকদের মতামত ২৪
আদি গ্রিক দার্শনিকদের মতামত ২৪
সক্রেটিস ২৫
প্লেটো ২৫
অ্যারিস্টটল ২৬
এপিকিউরিয়ান দার্শনিকগণ ২৬
স্টোয়িক দার্শনিকগণ ২৬
ফিলো ২৭
প্লটিনাস ২৭
সেন্ট অগাস্টিন ২৮
থমাস অ্যাকুইনাস ২৯
মিস্টার একহার্ট ২৯
ফ্রান্সিস বেকন ২৯
থমাস হবস ৩০
ডেকার্ট ৩০
স্পিনোজা ৩১
জন লক ৩১
জর্জ বার্কলে ৩২
ডেভিড হিউম ৩২
লিবনিজ ৩২
ইমানুয়েল কান্ট ৩৩
জোহান গোটলিব ফিচটে ৩৩
জোসেফ সেহেলিং ৩৩
ফ্রেডরিচ হেগেল ৩৩
গোস্তাব ফেকনার ৩৪
অগাস্ট কোঁৎ ৩৪
উইলিয়াম হ্যামিলটন ৩৪
হার্বার্ট স্পেন্সার ৩৪
ব্রাডলি ৩৫
উইলিয়াম জেমস ৩৫
জন ডিবি ৩৫

দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনা ৩৬
ধর্মের সূচনা একেশ্বরের ধারণা দিয়ে হয় ৩৬
ঈশ্বর নিছক একটি চালিকাশক্তি নন ৪০
খোদার মারেফত বা অভিজ্ঞান অর্জিত হতে পারে ৪৩

আল কুরআনের শিক্ষা ৪৫
স্রষ্টার অস্তিত্বের বাহাস অপ্রয়োজনীয় ৪৫
কুরআনের প্রথম শ্রোতাগণ স্রষ্টা অস্বীকারকারী ছিল না ৪৫
আহলে আকল সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন ৪৮
স্রষ্টার অস্তিত্ব একটি স্বজ্ঞাত বাস্তবতা ৪৮
স্রষ্টার অস্তিত্ব মনুষ্যবোধের ঊর্ধ্বে ৪৯
খোদাকে তাঁর গুণাবলি দ্বারা চেনা যায় ৫০
তাওহিদের ধারণা মানবপ্রকৃতিতে বিদ্যমান ৫১
মানবপ্রকৃতি শিরক পছন্দ করে না ৫২
সত্যিকার প্রয়োজনে মানুষ কেবল এক খোদারে ডাকে ৫৩
তাওহিদের পক্ষে মহাবিশ্বের সাক্ষ্য ৫৪
খোদা এক সুনির্দিষ্ট সত্ত্বা ৫৬
খোদার তার বান্দার সাথে সম্পর্ক ৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবিশ্বে মানুষের স্থান ৬১
দার্শনিকদের মতামত ৬৩
সক্রেটিসপূর্ব যুগ ৬৩
সক্রেটিস ৬৪
প্লেটো ৬৪
অ্যারিস্টটল ৬৫
স্টোইক দর্শন ৬৫
বিশাল শূন্যতার যুগ ৬৬
আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মতামত ৬৬
ডেকার্ট ৬৭
স্পিনোজা ৬৭
বার্কলে, লক এবং হিউম ৬৮
রুশো ৬৯
ইমানুয়েল কান্ট ৭০
শোপেনহাওয়ার ৭১
নিটশে ৭১
জন স্টুয়ার্ট মিল ৭২
স্পেন্সার ৭৩

জেমস ৭৪
জন ডিউই ৭৪
রাসেল ৭৫

দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনা ৭৬
সাবেক ঐশী ধর্মসমূহের শিক্ষা ৭৮

আল কুরআনে মানুষের স্থান ৮০
কুরআনের ইলমুল ইনসান বা মানবসৃষ্টিতত্ত্ব ৮০
কর্তৃত্ব ও কর্মের স্বাধীনতা ৮২
মানবিক মর্যাদা ৮৪
পথনির্দেশের ব্যবস্থা ৮৫
মহাবিশ্বের বশীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ ৮৭

খিলাফতের পদমর্যাদার দাবি ও প্রয়োজনীয়তা ৮৮
মোহাসাবা ও জবাবদিহিতা ৮৮
সামষ্টিকতার চেতনা ৮৯
মানুষের সমান মর্যাদা ৮৯
খিলাফতের প্রকৃত হকদার ৯০

তৃতীয় অধ্যায়

ভালো এবং মন্দ ৯৩
দার্শনিকদের মতামত ৯৫
হেরাক্লিটাস ৯৫
ডেমোক্রিটাস ৯৫
সোফিস্ট দার্শনিকগণ ৯৬
সক্রেটিস ৯৬
প্লেটো ৯৭
অ্যারিস্টটল ৯৮
এপিকিউরিয়ান এবং স্টোইক দর্শন ৯৮
ফিলো ৯৯
সেন্ট অগাস্টিন ৯৯
পিটার অ্যাবেলার্ড ১০০
থমাস একুইনাস ১০০
মিস্টার একহার্ট ১০১
থমাস হবস ১০১
ডেকার্ট ১০২
স্পিনোজা ১০২
জন লক ১০৩
রিচার্ড কম্বারল্যান্ড ১০৩
লিবনিজ ১০৩
ইমানুয়েল কান্ট ১০৪
জোহান ফিখতে ১০৪
আর্থার শোপেনহাওয়ার ১০৫
জন স্টুয়ার্ট মিল ১০৫
জেরেমি বেন্থাম ১০৫
হার্বার্ট স্পেন্সার ১০৬
জেমস এবং ডিউই ১০৬

দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনা ১০৭
আপেক্ষিকতার দর্শন ১০৭
ইচ্ছা ও নিয়তের মানদণ্ড ১০৮
সুখলাভের মাপকাঠি ১০৮
উপযোগের মানদণ্ড ১১০
ডেকার্টের দৃষ্টিভঙ্গি ১১০
স্পিনোজার মতবাদ ১১০
প্রকৃতির অনুপ্রেরণার তত্ত্ব ১১১
মন্দের অস্তিত্ব ১১১
ভালো এবং মন্দ কি হুকমি তথা নির্দেশগত? ১১২

আল কুরআনের শিক্ষা ১১৪
সর্বোত্তম মঙ্গল– তাওহিদ ১১৪
মানবপ্রকৃতিতে ভালো-মন্দের ইলহাম ১১৬
মানবাত্মার গোপন সতর্ককারী ১১৮
প্রকৃতিতে ভালো-মন্দের ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ ১১৯
উত্তরাধিকার এবং ধারাবাহিকতা ১২০
ভালো-মন্দের একটি প্রাকৃতিক মানদণ্ড ১২০
প্রকৃতির কর্তৃত্ব এবং ইচ্ছা আছে ১২১
ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে মন্দের উদ্ভব ১২২
ভালো এবং মন্দের স্রষ্টা কে? ১২২
তাৎক্ষণিক লাভের লোভ মন্দের কারণ ১২৩
শোলায়ে ইয়াযদানী বা ঐশ্বরিক শিখা ১২৪
শয়তানের বংশধারা ১২৫
শয়তানের ভূমিকা ১২৬
বিশ্বের সম্মিলিত বিবেক ১২৭
আলোচনার সারমর্ম ১২৮

চতুর্থ অধ্যায়

অদৃষ্ট এবং কর্তৃত্ব ১৩১
দার্শনিকদের মতামত ১৩৩
পিথাগোরাস ১৩৩
হেরাক্লিটাস ১৩৩
সোফিস্ট দার্শনিকগণ ১৩৩
সক্রেটিস ১৩৪
প্লেটো ১৩৪
অ্যারিস্টটল ১৩৫
এপিকিউরিয়ান দার্শনিকগণ ১৩৫
স্টোইক দার্শনিকগণ ১৩৬
ফিলো ১৩৬

প্লটিনাস ১৩৭
সেন্ট অগাস্টিন ১৩৭
অ্যাবি লর্ড ১৩৮
থমাস অ্যাকুইনাস ১৩৮
রেনেসা ১৩৯
ফ্রান্সিস বেকন ১৩৯
থমাস হবস ১৩৯
ডেকার্ট ১৪০
স্পিনোজা ১৪০
জন লক ১৪০
ডেভিড হিউম ১৪১
লিবনিজ ১৪১
ইমানুয়েল কান্ট ১৪২
জোহান ফিখতে ১৪৩
হেগেল ১৪৩
জন ফ্রিডরিচ হার্বার্ট ১৪৩
আর্থার শোপেনহাওয়ার ১৪৪
জন স্টুয়ার্ট মিল ১৪৪
থমাস হিল গ্রিন ১৪৪
উইলিয়াম জেমস ১৪৫
জন ডিউই ১৪৫

দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনা ১৪৬
মানুষের যন্ত্রাংশ হওয়ার যুক্তি ১৪৬
মহাবিশ্বের অনড় প্রাকৃতিক আইনের যুক্তি ১৪৭
কারণ এবং প্রভাবের শৃঙ্খল বা কার্যকারণ তত্ত্ব ১৪৮
ভলতেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৯
কর্তৃত্ব এবং তার সীমা ১৪৯
কর্তৃত্বে বুদ্ধির অপর্যাপ্ততার অসুবিধা ১৫১
অদৃষ্টবাদের পক্ষে খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের যুক্তি ১৫২
আদমের আ. এর পাপের প্রকৃতি ১৫৩
আদমের তওবার প্রতি খ্রিষ্টানদের ভ্রুক্ষেপহীনতা ১৫৪
আদমসন্তানের উপর পাপের দায় কেন? ১৫৬
পরিত্রাণের জন্য সৎকর্মের প্রয়োজনীয়তা ১৫৬
প্রায়শ্চিত্তের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস (আকিদায়ে কাফফারা) ১৫৭
অদৃষ্ট ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের মতামত ১৫৯
মুতাজিলার যুক্তি পর্যালোচনা ১৬০
আশারির যুক্তি পর্যালোচনা ১৬১

আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ১৬৫
ইনশাআল্লাহ-এর গুরুত্ব ১৬৭
তাকদিরের তাৎপর্য ১৬৭
হেদায়েত ও গোমরাহি সম্পর্কে আল্লাহর সুন্নাহ ১৬৮
অন্তর মোহরাঙ্কিত হওয়ার আইন ১৬৯

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

পরকাল এবং প্রতিদান ১৭৩
দার্শনিকদের মতামত ১৭৪
পিথাগোরাস ১৭৪
হেরাক্লিটাস ১৭৪
এম্পেডোকলস ১৭৫
লুইসিফাস এবং ডিমোক্রিটাস ১৭৫
প্লেটো ১৭৬
অ্যারিস্টটল ১৭৬
এপিকিউরিয়ান দার্শনিকগণ ১৭৭
স্টোইক দার্শনিকগণ ১৭৭
প্লটিনাস ১৭৭
সেন্ট অগাস্টিন ১৭৮
টমাস অ্যাকুইনাস ১৭৮
ফ্রান্সিস বেকন ১৭৮
থমাস হবস ১৭৯
ডেকার্ট ১৭৯
স্পিনোজা ১৭৯
জন লক ১৮০
জর্জ বার্কলে ১৮০
ডেভিড হিউম ১৮০
লিবনিজ ১৮১
ইমানুয়েল কান্ট ১৮১
জোহান ফিখতে ১৮১
আর্থার শোপেনহাওয়ার ১৮২
হার্মান লোটজ ১৮২
অগাস্ট কোঁৎ ১৮২
উইলিয়াম জেমস ১৮২

দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনা ১৮৪
আত্মার অস্বীকৃতির দর্শন ১৮৪
প্লেটোর দর্শনের ত্রুটি ১৮৬
কুরআনের মানব সৃষ্টিতত্ত্ব ১৮৭
অ্যারিস্টটলের দর্শনের ত্রুটি ১৮৯
ধর্মের ব্যাখ্যা-ভাষ্য ১৯০

আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ১৯২
নৈতিক ন্যায্যতার দিক থেকে বিষয়টির মূল্যায়ন ১৯৪
জগৎ ভগবানের লীলা হওয়ার ধারণা ১৯৪
জগৎসৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন নয় ১৯৫
মানুষ পরম লক্ষ্য নয় ১৯৭
খোদার স্বতঃসিদ্ধ গুণাবলির দাবি ১৯৮
রবুবিয়ত ও প্রভুত্বের দাবি ১৯৮
রহমত ও করুণার দাবি ২০০

মানবপ্রকৃতির দাবি ২০১
আল্লাহর আইন ও সুন্নাহের প্রয়োজনীয়তা ২০৩
মানুষের খলিফা হওয়ার দাবি ২০৫
একদিন ন্যায়বিচার কেন প্রয়োজন? ২০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবুওয়ত ব্যবস্থা ২০৯
দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ২১০
অ্যারিস্টটল ২১০
কান্ট এবং লক ২১১
প্যাসকেল ২১২
মুতাকাল্লিমিন ২১২
হবস ২১৩
দার্শনিকদের মতামতের পর্যালোচনা ২১৪
বিশ্বাসের জন্য অভিজ্ঞতার শর্তারোপ ২১৪
বুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয়ের পথের শর্ত ২১৫
ওহির মর্যাদা স্বীকারকারীদের রায় ২১৫
বুদ্ধি এবং বর্ণনার (আকল ও নকল) দ্বন্দ্ব ২১৬
আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ২১৭
ওহি বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে ২১৭
ওহি বুদ্ধিকে প্রশিক্ষিত করে ২১৮
ওহি বুদ্ধিকে পূর্ণতা দান করে ২১৮
ওহি মানবপ্রকৃতির আলোকে নিখুঁত করে ২১৯
ওহি মানুষের উপর যুক্তি সম্পন্ন করে ২২০
আলোচনার সারমর্ম ২২১
খতমে নবুওয়ত বা নবুওয়ত সমাপ্তির দার্শনিক ভিত্তি ২২১
নবুওয়তের সর্বজনীনতা ২২২
দ্বীনের পরিপূর্ণতা ২২৬
সুরক্ষার মহিমা ২২৭
দ্বীনের চিরপ্রাসঙ্গিকতা ২২৯
একটি বিভ্রান্তির অপনোদন ২৩১

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণাবলি

চিন্তা ও দর্শনের মানুষের সামনে সূচনা থেকেই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণাবলি সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণাবলি কী এবং সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি কী? অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টির পরে কি তার সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে আছেন, না সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি যদি তাঁর সম্পর্ক বজায় রাখেন, তবে তার ধরন কী এবং সৃষ্টি তথা মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের উপায় কী?

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো মানুষ স্রষ্টার মারেফত বা অভিজ্ঞান অর্জন করতে পারে কিনা? অর্থাৎ, খোদা কি মানববুদ্ধির নাগালের বাইরে যে মানুষ তাঁর কিছুমাত্র জ্ঞানার্জন করতে পারে না, বা খোদা মানুষের বুদ্ধির আওতায় ধরা দিতে পারেন?

তৃতীয় যে প্রশ্নটি তাদের সামনে ছিল, তা হলো স্রষ্টা কি মানুষের মতো একজন ব্যক্তি; যার গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য জানা যায়, নাকি স্রষ্টা সেসব শক্তি, ক্ষমতা এবং আইনের নামান্তর, যা মহাবিশ্বে এমনভাবে বিস্তৃত যেভাবে ইঞ্জিনে বাষ্প বা দেহের অভ্যন্তরে আত্মা। অর্থাৎ স্রষ্টা এমন এক শক্তি, যা মহাবিশ্বকে সচল রেখেছে।

এধরনের আরও প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু এইগুলো মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এগুলো ছাড়াও, সভ্যতা এবং ধর্মের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন দার্শনিকদের মতামতও বিবেচনার যোগ্য। যাদের বক্তব্য হলো আদিতে মানুষ এক ঈশ্বরের সাথে নয়, বরং বহু দেব-দেবীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে অপ্রয়োজনীয় দেবতারা ক্রমশ অপসৃত হয়ে গেল, একপর্যায়ে একটা মাত্র দেবতা রয়ে গেল। অন্য কথায়, ধর্ম শিরক ও বহুদেবতাবাদের সাথে শুরু হয়েছিল এবং তারপর ধীরে ধীরে মানুষ তাওহিদ ও একেশ্বরবাদের স্বাদ উপলব্ধি করল।